সিজোফ্রেনিয়া: মুক্তি বহুমুখী চিকিৎসায়

মো জহির উদ্দিন

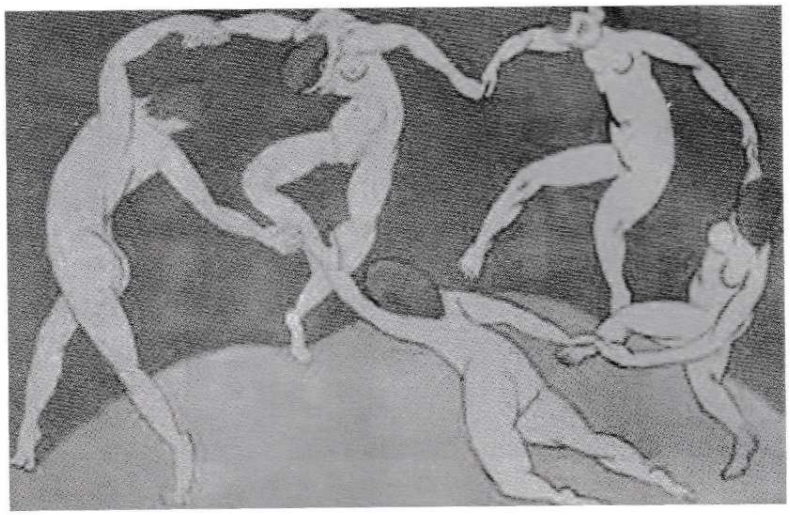

সজোফ্রেনিয়াকে একসময় বলা হতো সাইকিয়াট্রির ক্যান্সার। বলা হতো এটি ভালো হয় না। এমন বিশ্বাস এখনো বহুল প্রচলিত। যার সিজোফ্রেনিয়া হয় তার আচার-আচরণ হয় অদ্ভুত। সে এমন সব আচরণ করে যা কল্পনাও করা যায় না। একজন রোগীকে একবার খুজে পাওয়া যাচ্ছিল না। অনেক ডাকাডাকির পর তাল গাছের উপর থেকে তার সাড়া মিলল। ব্যাপার এই -- গরম লাগছিল। গ্রামের বাড়ি। বিদ্যুৎ নেই। তাই তাল গাছের মাথায়। বেশ বাতাস লাগছিল। রাত্রি বারোটার উপর। গ্রামের বাড়ি। সবাই খুব ভয় পেয়ে গেল। এক রোগীকে একবার দেখলাম মহা আনন্দে ড্রেনের পানি পান করছে। তার চোখ-মুখের ভাব দেখে বুঝলাম সে হয়তো ড্রেনটাকে ঝরনা বা এ ধরনের কোন পানির উৎস ভেবেছে। এক রোগীকে আত্মীয়-স্বজন বিয়ে দিয়ে দিল। বউ এসে রোগীর দেখাশোনা করবে। সকালে ওকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। কী বিষয়? পরে পাওয়া গেল মাঁচার উপর। রোগীর সাফ উত্তর। অনেক দিন মাটির উপর হাঁটাহাটি করেছি। এখন মাঁচার উপর কিছু দিন থেকে দেখি কী হয়। সিজোফ্রেনিক রোগীর মেজাজ-মর্জি অনেক সময় বেশ খারাপ থাকে। খামোখাই খেপে যায়। আসলে রোগীর মাথা বোঝাই থাকে নানা ধরনের ভুল ধারণা। একজন রোগীর ধারণা, কেউ যদি পায়ের উপর পা তুলে বসে পা দোলায় তার মানে সে রোগীকে ইঙ্গিত দিচ্ছে। তার সাথে খারাপ কাজ করতে চাচ্ছে। কত্ত বড় আস্পর্ধা! তাকে গিয়ে সোজা মার শুরু করে দিল। আরেক রোগী বিশ্বাস করত যে তার পিছনে পুলিশ লেগে গেছে। তার প্রেমিকা তার পিছনে পুলিশ লেলিয়ে দিয়েছে। ভয়ে সে আর বাঁচে না। এক জায়গায় দুই রাত্রি থাকার সাহসও তার নেই। কতদিন আর ফেরারি হয়ে থাকা যায়? কী কষ্ট! সার্জেন্ট হয়তো ওয়্যারলেসে কারো সাথে কথা বলে হাঁটছেন। এটার মানে তিনি এই রোগীর বিষয়ে কাউকে নির্দেশনা দিচ্ছেন। অনেক সময় রোগীর ভাষায় গোলমাল লাগে। তার কথাবার্তা পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় না। অনেক রোগী নিজের যত্ন নিজে নিতে পাওে না। বারবার না বললে নিজের নখ কাটে না, দাঁত মাজে না, গোসল কওে না। সারা গায়ে দুর্গন্ধ। এক জায়গায় চুপচাপ বসে বা শুয়ে থাকে। কথাও বলে না। কোন কাজ করে না। চাকুরি করে না, লেখাপড়া করে না। একা একা কথা বলে। বিড় বিড় করতেই থাকে। যেন কারো কথা শুনতে পাচ্ছে। তার কথার উত্তর দিচ্ছে। অন্য কেউ কিন্তু শুনছেও না, কিছু দেখছেও না। রোগী নিজেই একা একা শুনে। রোগী কোন কারণ ছাড়াই তার স্বামী বা স্ত্রীর চরিত্র নিয়ে গুরুতর সন্দেহ করে ও সাংঘাতিকভাবে তদন্ত শুরু করে। ধরে মারপিটও করে ফেলে। আসলে কিন্তু কিছুই না। রোগী বলে, তার খাবারে বিষ বা খারাপ কিছু মিশিয়ে দেয়া হয়েছে। না খেয়ে না খেয়ে তার শরীর দড়ির মতো হয়ে যায়। এক রোগী দীর্ঘদিন না খেয়ে না খেয়ে শেষে অপুষ্টিতে মরে গেল। এক রোগী নিজেকে সৃষ্টিকর্তার দূত মনে করত। এক রোগী বিশ্বাস করত, আসলে তার বাবার রূপ ধরে শয়তান ঘোরাফেরা করছে। কত বিচিত্র লক্ষণ হতে পারে সিজোফ্রেনিয়ার তা বলে আর শেষ করা যায় না। তবে সবার মধ্যে সব লক্ষণ কিন্তু থাকে না। মানসিক রোগের ডাক্তার বা সাইকিয়াট্রিস্টেরা সিজোফ্রেনিয়া রোগ নির্ণয় করে থাকেন।

বাংলাদেশে কি সিজোফ্রেনিয়ার রোগী আছে। উত্তর হলো, আছে। দেশব্যাপী পরিচালিত এক জরিপে দেখা যায়, দেশে শতকরা এক দশমিক এক ভাগ পূর্ণবয়সী মানুষের মধ্যে সিজোফ্রেনিয়া বা এ ধরনের গুরুতর মানসিক রোগ আছে। যদি ১৬ কোটি মানুষের মধ্যেই এই হারে এই রোগ আছে ধরে নিয়ে হিসাব করি তবে দেশে মোটামুটিভাবে ১৭ লাখ ৬০ হাজার সিজোফ্রেনিয়া রোগী আছে। এই সংখ্যা কিন্তু অবহেলা করার মতো নয়।

বাংলাদেশে সিজোফ্রেনিয়ার চিকিৎসার পুরো বিষয়টা খুব ভালোভাবে পরিচালিত হচ্ছে না। যতটুকু চিকিৎসা আছে তা শুধু ঔষধের প্রয়োগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তাও ঠিকমতো হচ্ছে না। এখনো কবিরাজ-পির-ফকিরের, তাবিজ-কবোজ ও ওঝার খপ্পর থেকে এই চিকিৎসা ডাক্তারের হাতেই আসেনি ঠিকমতো। অনেকে বোঝেই না যে এটি একটি রোগ। অনেকে জানে না কোথায় চিকিৎসা পাওয়া যায়। মানসিক রোগের যে ডাক্তার আছে, তাদের যে সাইকিয়াট্রিস্ট আছে তা-ই জানা নেই বেশির ভাগ মানুষের। যারা জানে তারাও ভুলভাবে জানে। ভাবে সাইকিয়াট্রিস্টের ঔষধ খেলে মানুষ আরো পাগল হয়ে যাবে। ফল হলো, সিজোফ্রেনিক রোগীর সাংঘাতিক দুর্ভোগ। তারা মার খায়, নির্যাতিত হয়। তাদের বিনা চিকিৎসায় শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয় পশুর মতো। ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস। চিকিৎসা আছে, কিন্তু জ্ঞান নেই।

বাংলাদেশে মানসিক রোগের ডাক্তাররা অ্যান্টিসাইকোটিক ঔষধ ব্যবহার করে সিজোফ্রেনিয়ার চিকিৎসা দিয়ে থাকেন। মুস্কিল হলো এই ঔষধগুলোর অনেক ধরনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া থাকে। রোগী চোখে ঝাপসা দেখে, তার শরীর কাঁপে, তার গলা শুকিয়ে আসে, পায়খানা কশা হয়ে যায়, অনেকে মোটা হয়ে যায়। সারাক্ষণ নেশাগ্রস্তের মতো ঘুম ঘুম লাগে। তাই রোগীরা এই ঔষধগুলো খেতে চায় না। প্রায়ই ছেড়ে দেয়। এছাড়া ঔষধ যে দীর্ঘদিন ধরে চালিয়ে যেতে হবে তা রোগী বা তার পরিবার বুঝতেও পারে না, মনে হয় বুঝতে চায়ও না। ঔষধ খাব, রোগ

ভালো হয়ে যাবে। সর্বোচ্চ দুই-এক সপ্তাহ ঔষধ খাব। তার বেশি আর কী দরকার, এমনটা চিন্তা। এছাড়া মানুষ গরীব। এই রোগের ঔষধ বেশ ব্যয়সাপেক্ষ। কেউ ঔষধ খেতে দেখে বুঝে ফেললে আর রক্ষা নেই। নির্ঘাত পাগল বলে কটাক্ষ করবে। সিজোফ্রেনিয়া হলে রোগী বুঝতে পারে না যে তার কোন রোগ হয়েছে। তার লক্ষণগুলোকে সে বাস্তব মনে করে। এক রোগী অভিভাবকদের আউটডোরের ডাক্তারের চেম্বারের বাইরে রেখে ডাক্তারকে একান্তে জানাল যে আসল পাগল হলো তার বাবা-মা। সে ভুলিয়ে-ভালিয়ে নিয়ে এসেছে। এখন ডাক্তার সাহেব একটু কড়া ঔষধ দিয়ে চিকিৎসা দিলেই হয়। এরকম জ্ঞান থাকলে রোগী ঔষধ খেতে চাইবার কথা নয়। তারা খেতে চায়ও না। সব মিলিয়ে ঔষধ নিয়মিত খাওয়া হয় না। ফলে বার বার অসুখের লক্ষণ বেড়ে গিয়ে মহা অশান্তি হয়।

ভালোভাবে ঔষধ ব্যবহার করলে ও অন্যান্য চিকিৎসা নিলে কিন্তু সিজোফ্রেনিয়ার লক্ষণগুলো অনেক কমে যায়। গবেষণায় দেখা যায় যে, এক তৃতীয়াংশ রোগী ঔষধের মাধ্যমে একদম ভালো হয়ে যায়। বাকি এক তৃতীয়াংশ ঔষধসহ ভালো থাকে। স্বাভাবিক জীবন-যাপন চালিয়ে নিতে পারে। বাকি এক তৃতীয়াংশের অসুখ ততোটা ভালো হয় না।

সিজোফ্রেনিয়ার চিকিৎসায় উন্নত বিশ্বে ঔষধের পাশাপাশি আরো নানা প্রকার চিকিৎসা ব্যবহৃত হচ্ছে। মানসিক রোগীরা দিনের পর দিন কোন কাজ করে না। তাদের নিজের যত্ন নেওয়ার ক্ষমতা অনেক সময় থাকে না। তারা চিত্তবিনোদন করে না। তারা সারা দিনে সময় কাটানোর কিছু পায় না। কিছুই করে না। ফলে তৈরি হয় ডিজঅ্যাবিলিটি বা অক্ষমতা। সে কিছু করতে ভুলে যায়। সিজোফ্রেনিয়া অল্পবয়সে হলে ক্ষতি হয় সব থেকে বেশি। রোগীরা কোন পেশায় কাজ করতে পারে না। অকুপেশনাল থেরাপিস্ট বলে এক ধরনের পেশাজীবী আছেন যারা এক্ষেত্রে রোগীকে সাহায্য করতে পারেন। বাংলাদেশে সাভারের চাপাইনে সিআরপি বলে একটি প্রতিষ্ঠানে অকুপেশনাল থেরাপির উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। অকুপেশনাল থেরাপিস্টরা সিজোফ্রেনিয়ার চিকিৎসায় তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। আমাদের পাশের দেশ ইন্ডিয়াতে বহুসংখ্যক অকুপেশনাল থেরাপি ইউনিট আছে। আমি দক্ষিণ ভারতের একটি অকুপেশনাল থেরাপি ইউনিট দেখেছি। আমাদের দেশেও এর বিশেষ প্রয়োজন। এগুলো হলে রোগীদের জীবনের গুণগত মানে পরিবর্তন আসত।

অনেক রোগী আছেন যারা চিকিৎসা নিয়ে বাসায় ফেরার পর আর আসে না। কেমন আছে তারা? তারা কি ঔষধ খাচ্ছে? তাদের পরিবারের পরিবেশটাই বা কেমন? তাদের সামাজিক জীবনটা কি ঠিক আছে? না তারা গুটিয়ে দিন কাটাচ্ছে। আটকে আছে নিজস্ব অদ্ভুত কল্পনার মধ্যে। দরজা-জানালা আটকে আঁধার ঘরে কাটাচ্ছে বছরের পর বছর। কে তাদের খবর নিবে? তাদেরকে স্বাভাবিক জীবনের দাওয়াত দিবে? বিদেশে সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্মীরা এই কাজটি করে থাকেন। গত কয়েক বছর ধরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ গবেষণা ইনস্টিটিউটের আওতায় ক্লিনিক্যাল সোস্যাল ওয়ার্ক নামে একটি কোর্স পড়ানো হচ্ছে। হয়তো এই সমাজকর্মীরা একদিন রোগীদের দুঃখ ঘুচাবে।

অনেক মানসিক রোগী আছেন যারা বড় মানসিক হাসপাতাল বা মেডিকেল কলেজ থেকে দূরে বসবাস করে। তাদের পক্ষে এত দূর থেকে এসে নিয়মিত চিকিৎসা নেয়া সম্ভব না। এজন্য উন্নত বিশ্বে প্রাইমারি হেলথ কেয়ার পর্যায়েই তাদের চিকিৎসাসেবা দেয়া হয়, এবং সেটা করেন সাধারণ এমবিবিএস ডাক্তাররা। অনেক দেশে প্রশিক্ষিত নার্সরা পর্যন্ত সিজোফ্রেনিক রোগীদের ঔষধের ফলোআপ করেন। জটিল কেসগুলো তারা ডাক্তারের কাছে পাঠান। সেগুলো আবার লক্ষণ নিয়ন্ত্রণ করে নার্সদের কাছে ফেরত পাঠানো হয়। শুনলে অবাক লাগে। অবিশ্বাস্য ব্যাপার। তাদের দেশেতো ডাক্তার আছে প্রচুর। তবুও তারা মানসিক রোগের ডাক্তার দিয়ে সব রোগীকে সেবা দিতে পারে না। আমাদের দেশের অবস্থা আরো খারাপ। দেশে মানসিক রোগের ডাক্তার মোটে ১১৫ জন। মানুষ ১৬ কোটি। কী অবস্থা! বিদেশি মডেল অনুসরণ করে বাংলাদেশ সরকার কাজ করছে। কাজ চলছে প্রাইমারি হেলথ কেয়ারের সঙ্গে মানসিক রোগের চিকিৎসা ইন্টিগ্রেটেড করার। হেলথ কমপ্লেক্সের এমবিবিএস ডাক্তাররাই সিজোফ্রেনিয়ার চিকিৎসা দিবেন। তাদের এত দূর এসে চিকিৎসা নিতে হবে না। সরকারের এসেন্সিয়াল ড্রাগ লিস্টে অ্যান্টিসাইকোটিক ঔষধসহ বেশ কয়েক ধরনের মানসিক রোগের ঔষধ অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এই প্রক্রিয়াটি বাস্তবায়িত হলে অনেক রোগী উপকার পাবে। চিকিৎসা বাদ দেওয়ার প্রবণতা কমে যাবে অনেকটা। তবে মক্কা বহু দূর। এখনো এই প্রক্রিয়া বাস্তবায়িত হতে অনেক সময় লাগবে। তবে আশার কথা, কাজ চলছে। এক দিন না এক দিন হবেই।

উন্নত বিশ্বে সিজোফ্রেনিয়ার চিকিৎসায় আর্ট থেরাপি ব্যবহৃত হচ্ছে। গবেষণায় সিজোফ্রেনিয়া চিকিৎসায় এর সাফল্য দেখা গেছে। আর্ট থেরাপিতে ছবি আঁকা, গান, ছন্দ এবং নৃত্যকে ব্যবহার করা হচ্ছে। বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত আর্ট থেরাপির কোন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নেই। আমার জানামতে প্রশিক্ষিত আর্ট থেরাপিস্ট নেই একজনও।

উন্নত বিশ্বে সিজোফ্রেনিয়ার চিকিৎসায় সাইকোলজিক্যাল থেরাপি বা সাইকোথেরাপির প্রয়োগ ব্যাপক। গবেষণায় দেখা গেছে, এক্ষেত্রে 'কগনিটিভ বিহেভিয়র থেরাপি' বিশেষ ফলপ্রসূ। এই ধরনের চিকিৎসায় রোগীর ত্রুটিপূর্ণ চিন্তাগুলোকে পরোক্ষভাবে পরিবর্তন করে তার রোগের লক্ষণগুলো কমানো হয়। এছাড়া, আচরণের মধ্যেও ইতিবাচক পরিবর্তন আনা হয়। ফলে রোগী রোগ থাকা সত্ত্বেও জীবনপথে দৃপ্ত পায়ে এগিয়ে যায়। তার জীবনের গুণগত মানে উন্নতি ঘটে। তার ডিজঅ্যাবিলিটি বা পরনির্ভরশীলতা কমে অনকখানি। বাংলাদেশে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টরা 'কগনিটিভ বিহেভিয়র থেরাপি বা সিবিটি' দিয়ে থাকেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগে

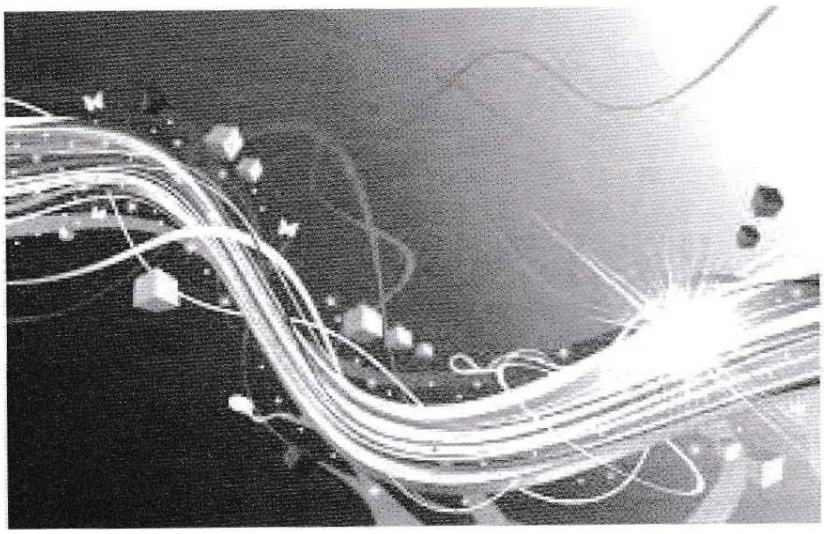

ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি পড়ানো হয়। বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত মাত্র ৪৩ জন ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট তৈরি হয়েছে। এদের একটি অংশ আবার দেশের বাইরে চলে গেছে। ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টরা অনেক ধরনের সাইকোথেরাপি দিয়ে থাকেন।

অনেক সময় সিজোফ্রেনিক রোগীও যে মানুষ তা আমরা ভুলে যাই। তার মনে কথার পাহাড়। কত অদ্ভুত কথা মনে ঘুরে বেড়ায়। কেউ শুনে না। কত প্রশ্ন মনের মধ্যে। কে দেবে উত্তর? ঔষধের পাশাপাশি এই রোগীদের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা দরকার। একে বলে সাপোর্টিভ কাউন্সেলিং। মাসে দুই-একবার অন্তত এক ঘন্টার জন্য বসা দরকার।

সিজোফ্রেনিক রোগীদের সবার সমান অবস্থা হয় না। অনেকের সাথে কথা বলা চলে। তাদেরকে তাদের মতো করে সহজ ভাষায় তাদের রোগটি কী, এর চিকিৎসাই বা কী, তা ভাল করে বোঝানো দরকার। একে বলে সাইকোএডুকেশন। রোগীর পরিবারের সদস্যদের, বিশেষভাবে রোগীর মূল যত্নগ্রহণকারী সদস্যদের, রোগটি কী, লক্ষণ কী, রিক্ত রাগ হলে কী করতে হবে, ঔষধ কেন দেওয়া দরকার, প্রতিক্রিয়া কী, কীভাবে এগুলো নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, কী ধরনের রিবারিক পরিবেশ রোগীর জন্য ভালো, রোগীর সামাজিক জীবন কীভাবে বাড়াতে হবে, তার যত্নগ্রহণ করতে হবে কীভাবে, কীভাবে তাকে স্বনির্ভর করে গড়ে তুলতে হবে, তার পেশাগত কাজে কীভাবে তাকে যুক্ত করা যায়, রোগটি বংশে ছড়ায় কিনা, রোগীর বিয়ে দেওয়া দরকার কিনা, দিতে হলে কী কী সতর্কতা প্রয়োজন ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত বুঝিয়ে বলা হয় সাইকোএডুকেশন সেশনে। বাংলাদেশে ব্যক্তিগত পর্যায়ে, অর্থাৎ একজন অভিভাবকের সঙ্গে একজন সাইকোলজিস্ট বসে, সাইকোএডুকেশন দিয়ে অনেকগুলো ভালো ফল পাওয়া গিয়েছিল। এতে রোগীর পরিবারের সদস্যদের মানসিক চাপ কমেছিল, তাদের সিজোফ্রেনিয়া বিষয়ক জ্ঞান বেড়েছিল এবং পুরো বিষয়টি রোগীর যত্নগ্রহণে ভালো প্রভাব ফেলেছিল। পৃথিবীর অনেক দেশে রোগীর পরিবারের সদস্যদের গ্রুপে সাইকোএডুকেশন দেওয়া হয়। আমার কর্মস্থল জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটে ভর্তি সিজোফ্রেনিক রোগীদের মূল যত্নগ্রহণকারীদের আমরা রোগী ভর্তিকালীন সময়ে সপ্তাহে একটি করে মাসে তিনটি সাইকোএডুকেশন দিয়ে ভালো ফল পেয়েছি। তবে এটি গবেষণা ছিল না। রোগীর অভিভাবকরা বাচনিকভাবে তাদের সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। আমার মতে এতে পরিবারের সদস্যদের জ্ঞান বেড়েছিল, তাদের মানসিক চাপ কমেছিল, এবং তারা রোগীর যত্নগ্রহণে আরো পারদর্শী হয়ে উঠেছিল, যা রোগীদের পুনঃপুনঃ অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার প্রবণতা কমাতে সাহায্য করবে বলে আশা করছি।

সিজোফ্রেনিয়ার রোগীদের আত্মীয়-পরিজনদের অবস্থা বড়ই মর্মান্তিক। কোন কোন রোগীর নিবীড় পরিচর্যা লাগে। কারো কারো রাগ বেশি। মেয়ে সিজোফ্রেনিয়া রোগী হলে আরো কিছু সমস্যা পরিবারকে মোকাবেলা করতে হয়। এই রোগীদের অনেকে চুপচাপ একদিকে হাঁটা দেয়। কোথায় যাচ্ছে তা বলতেও পারে না। অনেকে নিজের নাম, বাবা-মার নাম, ঠিকানা কিছুই বলতে পাওে না। কাজেই মেয়ে রোগী যাতে কোন বিপদে না পড়ে তার জন্য পরিবার-পরিজন তটস্থ থাকে। বেশ কিছু গবেষণায় রোগীর যত্নগ্রহণকারীদের মনের চাপ অনেক বেশি বলে পাওয়া গেছে। আমার নিজের একটি গবেষণায় এই প্রাথমিক যত্নগ্রহণকারীদের শতকরা ৫০ ভাগেরও বেশি লোকের মধ্যে মানসিক চাপ এত বেশি পাওয়া গিয়েছিল যে তা মানসিক রোগীদের সমতুল্য। বাংলাদেশে এই পরিবার-পরিজন, যারা ২৪ ঘন্টা একটা অদ্ভুত চাপপূর্ণ পরিবেশে সিজোফ্রেনিয়া রোগীদের সেবা করছে তাদের চিকিৎসা বা মানসিক সমর্থন দেওয়ার মতো ব্যবস্থা গড়ে উঠেনি। যে নিজেই চরম মানসিক চাপের মধ্যে আছে সে রোগীর সেবাও ভালোভাবে করতে পারবে না। এবিষয়ে উদ্যোগী হওয়া বিশেষ জরুরি। যতদিন কোন ভালো ব্যবস্থা গড়ে না উঠছে ততদিন পরিবারের তরফ থেকেই কিছু উদ্যোগ নিতে হবে। নিয়ম হলো সিজোফ্রেনিয়ার পরিচর্যাকারী যাতে সপ্তাহে অন্তত একদিন এই দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পায় এবং প্রতিদিন যাতে পর্যাপ্ত বিশ্রাম পায় তার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। রোগীর চিকিৎসাও ভালোভাবে করতে হবে। তাহলে যত্নগ্রহণকারীর পক্ষে তাকে সামলানো সহজ হবে।

উন্নত বিশ্বে সিজোফ্রেনিয়া রোগীদের চিকিৎসার জন্য 'হেলিউসিনেশন গ্রুপ বা গায়েবি আওয়াজ গ্রুপ' পরিচালনা করা হয়। যে সিজোফ্রেনিক রোগীদের 'হেলিউসিনেশন', বিশেষত 'অডিটরি হেলিউসিনেশন', হয় অর্থাৎ যারা গায়েবী আওয়াজ শোনে তারা একটি ছোট দলে বসে একজন থেরাপিস্ট/সাইকোলজিস্টের তত্ত্বাবধানে কেন তারা এভাবে কানে ভুল শুনছে, কেউ শুনছে না অথচ তারা কেন শুনছে, তার একটা ব্যাখ্যা খুঁজতে চেষ্টা করে। তারা এই *'গায়েবি আওয়াজের' সঙ্গে খাপ খাইয়ে* চলতে শিখে। রোগীরা সাধারণত গায়েবি আওয়াজের পক্ষে একধরনের প্রতিক্রিয়া করতে থাকে। ফলে মানুষ দেখে তারা বিড় বিড় করে কার সঙ্গে যেন কথা বলছে। মানুষ বুঝে যে এই লোকটি একজন মানসিক রোগী। যদি রোগী এটা বন্ধ করতে পারে, যদি গায়েবি আওয়াজের কথাগুলোকে তারা পাত্তা না দেয় তবে তারা জীবনে আরো ভালোভাবে খাপ খাইয়ে চলতে পারবে। এই রোগীরা নিবিড়ভাবে রিল্যাক্সেশন ব্যায়াম শিখে। রিল্যাক্সেশন পেশির ব্যায়াম, কল্পনা ও নিয়ন্ত্রিত শ্বাস-প্রশ্বাস চর্চার মাধ্যমে করা যায়। সিজোফ্রেনিয়ার রোগীরা চরম মাত্রায় উৎকণ্ঠায় ভুগে থাকে। গভীরভাবে রিল্যাক্সেশন করাতে পারলে তারা কিছুটা শান্তি পায়। রোগীরা তাদের নিজেদের দুঃখের কথা বলে ও একে অপরকে মানসিক সমর্থন জুগিয়ে মনে একধরনের শান্তি পায়। তারা গায়েবি আওয়াজকে সহজভাবে নেয়, কানে হেডফোন লাগিয়ে গান শুনে বা মানুষের সঙ্গে গল্প করে তাদের গায়েবি আওয়াজ নিয়ন্ত্রণ করে। জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটে ভর্তি সিজোফ্রেনিক রোগীদের নিয়ে আমরা কয়েক মাস ধরে এধরনের গ্রুপ পরিচালনা করার চেষ্টা করেছিলাম। ফল ততটা সুখকর হয়নি। রোগীরা এত বেশি মানসিক চাপ ও কষ্টে থাকে, এত অস্থির ও অমনোযোগী থাকে যে তাদের রিল্যাক্সেশন করাতে বা গ্রুপে কথা বলাতে রোগী-প্রতি প্রায় একজন করে সাইকোলজিস্ট বা ডাক্তার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এই গ্রুপগুলো আমরা করতেও পেরেছি অল্প সময়ের জন্য। একঘন্টা বসিয়ে রাখা ছিল দুঃসাধ্য। গ্রুপগুলো সপ্তাহে একবার করে ৩০ মিনিটের জন্য করা গেছে। ভর্তি রোগী থাকায় ওয়ার্ডের মধ্যে গ্রুপ পরিচালনা করতে গিয়ে বেশ বেগ পেতে হয়েছে। অন্যান্য ভর্তি রোগীরা ভিড় করে দাঁড়িয়ে গ্রুপের পরিবেশ বিঘ্নিত করত। গ্রুপের জন্য আমাদের রোগী বাছাইতেও কিছুটা সমস্যা ছিল। আরেকটু কম লক্ষণযুক্ত রোগী নিলেই বোধ হয় ভালো হতো। যাহোক, যতটুকু করা গেছে তাতেও কিন্তু রোগীরা কিছুটা উপকৃত হয়েছে। সারাদিনে এই দুঃখী মানুষগুলো ওয়ার্ডে বসে থাকে। করার নেই কিছু। গ্রুপে থাকাকালে তবুও একটু পরিবর্তন হয় পরিবেশের। তাছাড়া রিল্যাক্সেশন ও আবেগের প্রকাশ ও গায়েবি আওয়াজের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে শিখানোর মাধ্যমে রোগীর বেশ কিছুটা উপকারও হয়েছিল। এই ধরনের দল পরিচালনা ছিল নতুন অভিজ্ঞতা। বাংলাদেশে সিজোফ্রেনিয়ার রোগীদের জন্য এমন ধরনের চিকিৎসা-সুযোগের ব্যবস্থা করা বিশেষ দরকার।

সিজোফ্রেনিয়ার রোগীরা সামাজিক দক্ষতা ভুলে যায়। যেসব রোগী চিকিৎসায় কিছুটা উন্নত হয়েছে তাদেরকে দলীয় পরিবেশে সামাজিক দক্ষতা প্রশিক্ষণ দেওয়া দরকার। ফলে তারা সমাজে ফলপ্রসূভাবে মিশতে পারবে। বাংলাদেশে আমরা মানসিক রোগীদের সামাজিক দক্ষতা

প্রশিক্ষণ দেওয়া দরকার। ফলে তারা সমাজে ফলপ্রসূভাবে মিশতে পারবে। বাংলাদেশে আমরা মানসিক রোগীদের সামাজিক দক্ষতা প্রশিক্ষণ দিয়েছি। দলে এটি দেওয়া হয়। একটি প্রশিক্ষণ মডিউল অনুসরণ করে মোটামুটি ১২ থেকে ১৫ সপ্তাহে এটি দেওয়া হয়। সপ্তাহে একটি করে প্রশিক্ষণ গ্রুপ করা হয় -- দুই ঘন্টা করে গ্রুপ চালাতে হয়। সামাজিক দক্ষতা প্রশিক্ষণ গ্রুপে তিনজন মনোবিজ্ঞানী থাকা দরকার। তাদেরকে অভিনয়েও কিছুটা দক্ষ হতে হয়, যাতে তারা রোল প্লে করে করে শেখাতে পারে। এধরনের গ্রুপ জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগের ডা. নাসিরুল্লাহ সাইকোথেরাপি ইউনিট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি ও আরো কয়েকটি জায়গায় করা হয়েছে। তবে অংশগ্রহণকারীরা কেউ সিজোফ্রেনিক ছিল না, ছিল সোশ্যাল ফোবিয়া বা সমাজভীতির রোগী। তবে একই ধরনের মডিউলে সামান্য পরিবর্তন এনে সিজোফ্রেনিক রোগীদের সামাজিক দক্ষতা প্রশিক্ষণ গ্রুপ পরিচালনা করা সম্ভব। বর্তমানে দেশের ভিতর সিজোফ্রেনিক রোগীদের সামাজিক দক্ষতা প্রশিক্ষণের জন্য কোন গ্রুপ পরিচালিত হচ্ছে না।

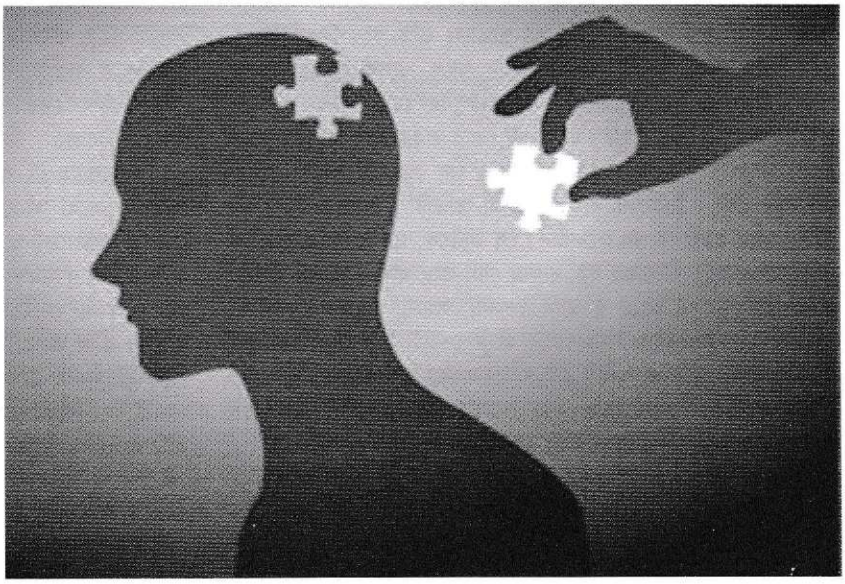

সিজোফ্রেনিক রোগীদের ব্যক্তিগত পর্যায়ে সাইকোথেরাপি দেওয়া যায়। এভাবে সাইকোএডুকেশন, রিল্যাক্সেশন, সাপোর্টিভ সাইকোথেরাপি ও কগনিটিভ বিহেভিয়র থেরাপি দেওয়া যায়। উন্নত বিশ্বে বিশেষভাবে দক্ষ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টরা এধরনের সেবা দিয়ে থাকে। মনে রাখা প্রয়োজন, এধরনের সাইকোলজিক্যাল সেবা রোগীদের পরিপূর্ণভাবে সুস্থ করে তোলে না, বরং এগুলো রোগীর ঔষধ গ্রহণ করার বিষয়টি নিয়মিত করে, তার লক্ষণ কমায়, জীবনের গুণগত মানের উন্নয়ন ঘটায় ও তার ডিজঅ্যাবিলিটি কমিয়ে তাকে বেশ স্বনির্ভর করে তোলে। আমার কর্মস্থল জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটে আমি ও আমার সহকর্মীরা ব্যক্তিগত পর্যায়ে সিজোফ্রেনিক রোগীদের সাইকোথেরাপি দিয়েছি। ফলে রোগী ও তার পরিবারের সদস্যরা ভালো বোধ করেছে, রোগীর জীবনের গুণগত মান বেড়েছে, কোন কোন রোগী পেশায় যুক্ত হতে উৎসাহিত হয়েছে। বিয়ে করার ক্ষেত্রেও রোগী ও তার পরিবার সতর্ক হতে পেরেছে। সাইকোথেরাপিতে সিজোফ্রেনিয়া ভালো হয়নি, ভালো করার লক্ষও ছিল না। তবে তারা উপকার পেয়েছে।

সিজোফ্রেনিয়া রোগীর পরিবারের পরিবেশ অনেক সময় ভালো থাকে না। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে পরস্পরের সম্পর্কে অতিরিক্ত সমালোচনা করার প্রবণতা দেখা যায়। তারা একে অপরকে মাপ করতে পারে না। মানসিক সমর্থন দেওয়ার বদলে চলে সমালোচনা। খুব বেশি রাগারাগি হয়। সদস্যদের আবেগের আতিশয্য থাকে। তারা দীর্ঘক্ষণ একসঙ্গে থাকে আর একে অপরের পিছে লেগেই থাকে। এই পরিবেশকে মনোবিজ্ঞানের ভাষায় বলে 'হাই-এক্সপ্রেসড্ ইমোশন পরিবার'। হাই-এক্সপ্রেসড্ ইমোশন বা আবেগের এই অতিশয্যের কারণে একবার সিজোফ্রেনিয়ার লক্ষণ কমলেও আবার বেড়ে যায়। আর যদি কারো একবার লক্ষণ বাড়া থাকে তবে এই ধরনের পরিবেশের কারণে লক্ষণ সহজে কমে না। বিশেষজ্ঞরা ফ্যামিলি থেরাপি দিয়ে এই ধরনের হাই-এক্সপ্রেসড্ ইমোশন কমানোর ব্যবস্থা করেন। এই প্রক্রিয়ায় পরিবারের সকল সদস্যদের ডেকে তাদের নিয়ে বৈঠক করে কী করা যায় তা ঠিক করা হয়। তাদের মধ্যকার পারস্পরিক যোগাযোগ বা কমিউনিকেশন উন্নত করার জন্য বিভিন্নমুখী পদক্ষেপ নেয়া হয়। সাধারণত দুই ঘন্টা করে প্রতি ১৫ দিনে একটি করে ফ্যামিলি থেরাপি দেওয়া হয়। বাংলাদেশে খুবই স্বল্প পরিসরে (প্রায় নেই বললেই চলে) ফ্যামিলি থেরাপি দেওয়া হচ্ছে। জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটে সিজোফ্রেনিক রোগীদের পরিবারের সদস্যদের ডেকে স্বল্প পরিসরে ফ্যামিলি থেরাপি দিয়ে আমরা ভালো ফল পেয়েছি।এধরনের থেরাপি হাই-এক্সপ্রেসড্ ইমোশন কমাতে বিশেস ফলপ্রসূ। ফ্যামিলি থেরাপির সেবা আরো অনেক বাড়ানো প্রয়োজন।

সিজোফ্রেনিয়ার চিকিৎসার সফলতা কিন্তু সামাজিক মনোভাবের উপরও নির্ভর করে। আমরা যদি মানসিক রোগ নিয়ে লজ্জিত থাকি, রোগীদেরকে বিরক্ত করে একধরনের দূষিত আনন্দ পাই তবে চিকিৎসার সফলতা কমে যেতে পারে। ধরুন রোগীর চিকিৎসা খুব ভালোভাবে দেওয়া হলো। কিন্তু সে যখন কোন কাজে বাইরে গেল তখন লোকে তাকে পাগল বলে খেপাল। তাদের বাড়িকে লোকে পাগলের বাড়ি বলল। মানুষ এই রোগীর পরিবারের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে অস্বীকার করল। এই পরিবারটিতে নিজেদের সন্তানদের খেলতে দিল না। ফলে পরিবারটি সমাজবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। সহজেই অনুমান করা যায়, এই বিচ্ছিন্নতা সিজোফ্রেনিক রোগীর মনের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। এই মনোভাব পরিবর্তন করা বিশেষ প্রয়োজন। এজন্য সমাজের সচেতনতা তৈরির জন্য নানা ধরনের সামাজিক সংগঠনের কাজ করা দরকার। এজন্য রোগীদের আত্মীয়-পরিজনদের নিয়ে গঠিত প্যারেন্টস অরগানাইজেশন বিশেষভাবে সহায়ক হয়। আমাদের দেশে এধরনের সংগঠনের বিশেষ ঘাটতি আছে। আমার জানামতে একটি মাত্র প্যারেন্টস অরগানাইজেশন আছে -- 'ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ফর মেন্টাল হেলথ এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন'। এর অবস্থাও নিতান্ত নাজেহাল। এদেশের সিজোফ্রেনিক রোগীর পরিবারেরা একসঙ্গে মিলে সংগঠন করার ব্যাপারে ততটা সচেতন নয়। আমার সন্তানের সিজোফ্রেনিয়া আছে এটা মানাই একটি বিরাট সাহসের কাজ। বলার কথা আরো পরে। সংগঠিত হয়ে সমিতি করাতো আরো সাহসের কাজ।

সিজোফ্রেনিয়ার চিকিৎসায় উন্নতি করতে হলে এই রোগীদের মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নতি করা দরকার। বর্তমানে রোগীদের অধিকারের কথাই মানুষ বুঝে না। মনোভাব অনেকটা এমন -- 'মানসিক

রোগীর আবার কী অধিকার'। অনেকে মনে করে, ধরে মার লাগালেই রোগী ভালো হয়ে যাবে। রোগী হাসপাতালে ভর্তি হবে কিনা, অথবা ঔষধ খাবে কিনা বা কী ধরনের ঔষধ খাবে, এসব বিষয়ের ওপর রোগীর বিন্দুমাত্র নিয়ন্ত্রণ থাকে না। জোরপূর্বক রোগীকে হাসপাতালে আটকে চিকিৎসা দেওয়া হয়। ফলে এই জোর-জবরদস্তির অপব্যবহারের একটা সম্ভাবনা থেকেই যায়। এক্ষেত্রে কোন সরকারি আইন অথবা নজরদারি নেই। আইনের মাধ্যমে রোগী ভর্তিটি যুক্তিসঙ্গত কিনা তা পরীক্ষা করে দেখা বিশেষ প্রয়োজন। যে কাউকে ধরে একবার মানসিক হাসপাতালে দিতে পারলেই হয়, বোঝা গেল তার মাথায় সমস্যা আছে। 'কে বললো সমস্যা আছে । আমি বললাম, সমস্যা আছে। সমস্যা না হলে কি আর ঔষধ খায়?' যেমন ধারা মানুষ তেমনি তার যুক্তিবোধ! যদি প্রস্তাবিত মানসিক স্বাস্থ্য আইন ২০১৪-এর চূড়ান্ত সংস্করণে মানবাধিকার রক্ষিত হয় তবে আশা করা যায় দেশের সিজোফ্রেনিক রোগীদের মানবাধিকার পরিস্থিতির তাৎপর্যপূর্ণ উন্নতি হবে।

সিজোফ্রেনিয়ার রোগীদের সেবা দেওয়া এক কঠিন কাজ। এজন্য পরিবারগুলো খুব চাপের মুখে থাকে। উন্নত বিশ্বে দিনের বেলার সময়টা এই রোগীরা 'ডে কেয়ার সেন্টারে' থাকে। ডে কেয়ার সেন্টারে তারা নানা ধরনের সেল্ফ কেয়ার স্কিল বা স্বনির্ভরতার দক্ষতা শিখে, চিত্তবিনোদন করে ও বিশ্রাম নেয়। তারা কিছু পেশাগত কাজও শিখে। দিনশেষে রোগী তার পরিবারে ফেরত যায়। ফলে রোগী উপকৃত হওয়ার পাশাপাশি, তার পরিবারও কিছুটা হাপ ছেড়ে বাঁচে। বাংলাদেশে কোন ডে কেয়ার সেন্টার নেই। আমি ইংল্যান্ডে কয়েকটি ডে কেয়ার সেন্টার দেখেছিলাম। বাংলাদেশেও এগুলো হলে রোগীরা বিশেষভাবে উপকৃত হতো।

সিজোফ্রেনিয়ার কারণ সম্পর্কে নানা রকম মত প্রচলিত। এই রোগের কারণের বিষয়ে এখনো পরিষ্কার করে জানা যায়নি। কেউ বলছে এটি মস্তিস্কের নিউরোকেমিক্যালের গণ্ডগোল থেকে হয়, আবার কেউ বিভিন্ন সামাজিক কারণকে দুষছে। এমনকি কেউ কেউ এতটাও বলছে যে সিজোফ্রেনিয়া একটি রোগ নয়, বরং অনেকগুলো রোগকে আমরা একটি রোগ মনে করছি। নানা বিতর্ক চলছে। তবে এপর্যন্ত বিশেষজ্ঞরা একটি বিষয়ে খুবই পরিষ্কার হয়েছেন যে, এই রোগের চিকিৎসা শুধুমাত্র ঔষধ দিয়ে হবে না। মানসিক রোগের ডাক্তারের পাশাপাশি সাইকোলজিস্ট, অকুপেশনাল থেরাপিস্ট, সোস্যাল ওয়ার্কার সবারই একটা ভূমিকা আছে। এছাড়া চিকিৎসার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে প্রত্যন্ত এলাকাগুলোতেও। বাংলাদেশ একটি মধ্য আয়ের দেশ হয়ে উঠার প্রক্রিয়ার মধ্যে আছে। ভালোটাই আশা করা যাক। আশা করা যাক, দেশের সিজোফ্রেনিয়া রোগী ও অন্যান্য মানসিক রোগীদের জন্য বিভিন্ন পেশাজীবিদের সমন্বয়ে মানসিক স্বাস্থ্য টিম করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হবে। আমরা মেডিকেল মডেল থেকে বের হয়ে বায়োসাইকোসোস্যাল মডেলে কাজ করব, সেই প্রত্যাশা হোক সবার। সিজোফ্রেনিয়া রোগীর চিকিৎসা সফল হতে হলে এই রোগের প্রাথমিক পর্যায়ে রোগটিকে সনাক্ত করে চিকিৎসা দিতে হবে। এছাড়া সামাজিক মনোভাব পরিবর্তিত হতে হবে। রোগীদের মানবাধিকারও নিশ্চিত করতে হবে।

ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট;
এসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অব ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি,
জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট